মহাভারতের কথা

হিন্দোল ভট্টাচার্য

'মহাভারতের কথা' কেবলমাত্র বাংলাসাহিত্য কেন বিশ্বাসাহিত্যের একটি অননুকরণীয় গ্রন্থ, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গেলে স্বভাবতই বুদ্ধদেব বসুর গদ্য নিয়ে কথা বলতেই হয়। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে অনেক আলোচনাই হয়েছে এবং হবেও, কিন্তু আমার কাছে বুদ্ধদেব বসু গুরুত্বপূর্ণ কেবল এই কারণেই নয় যে, তিনি বাংলাগদ্যকে শিক্ষিত করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের পর, বা বিশ্বসাহিত্যকে বাংলাভাষার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন যুক্তি - তথ্য - তত্ত্ব - গবেষণা এবং ভাষার রসবোধের অপরূপ চলনের মাধ্যমে, বরং এ-কারণেও, যে, তাঁর গদ্য 'ভাবতে - ভাবতে' যায়।

মহাভারতের কথা বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘকালীন আধুনিক ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'মহাভারত পাঠ', তার বিনির্মাণ এবং নায়কের 'ধারণা' -কে নস্যাৎ করে গড়ে -তোলে অন্য - এক 'নায়ক' -এর বাস্তবরূপ যাকে 'মিথিকাল প্যারালিজ্‌ম' বা 'মিথিকাল মাইমেসিস' কোনওভাবেই করা যায় না। বরং, বলা ভাল, বুদ্ধদেব অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করেছেন ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক এবং রূপমাত্মক বিষয়গুলিকে, সেগুলির শাঁস ছাড়িয়েছেন এবং মহাকাব্যের - ভিতরে থাকা ঘটনাবলির বর্ণনাগুলিকে সেই দর্শনের প্রতিষ্ঠিত পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক চোখ দিয়ে। 'মহাভারতের কথা' তাই আমার কাছে মহাভারতের এমন - এক আধুনিক পাঠ, যার মধ্য দিয়ে মহাভারতের কবির পাশাপাশি, আধুনিক মনন নিয়ে চর্চিত 'পাঠ' -কে ভেঙে ফেলে কীভাবে নিজস্ব 'পাঠ' নির্মাণ করতে হয়, 'মহাভারতের কথা' তারও এক উদাহরণ। এ-বিষয়ে বিশদভাবে লিখতে গেলে একদম প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত বুদ্ধদেবের মহাভারত - পাঠ এবং তাঁর ভাবনাগুলি নিয়ে ধরে - ধরে লিখতে হয়, এবং তা এক স্বতন্ত্র গ্রন্থের দাবি তৈরি করে। কারণ, প্রথমত বিষয়টি মহাভারত এবং দ্বিতীয়ত মহাভারত - পাঠের 'আধুনিক' পাঠক্রিয়া 'পাঠ'। সুতরাং এমনিতেই জটিল। এ অনেকটা সৌন্দর্যকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও 'বোঝা' -কে নিজের মতো করে বুঝে সেই সৌন্দর্য বোঝার সৌন্দর্যকে অবলোকন করার মতো। সুতরাং তার পরিসর এখানে নেই। এখানে ভূমিকাটুকু থাক।

বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা গ্রন্থটিকে আমি যদি এ-ভাবে পড়ি, যে, গ্রন্থটির ভিতরে আদতে চারটি গ্রন্থ রয়েছে। মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে কীভাবে পড়তে হয়, মহাভারতের এবং ব্যাসদেবের কবিত্বে উপনিষদের প্রভাব, মহাকাব্যের মধ্য-চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠিত চরিত্রগুলি সমাজে কাব্যের আখ্যানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়— এই চারটি বিষয় বুদ্ধদেব বসু একটি 'পাঠ' -এর মধ্যে নিয়ে এসে তথাকথিত বীররসের যে-মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা, তথাকথিত 'প্রজ্ঞা'-র যে-কাব্যিক পারস্‌পেকটিভ, তাকেই দিলেন উলটে। ফলে 'নায়ক' -এর সংজ্ঞা আর এপিকধর্মী রইল না, হল মনস্তত্ত্বধর্মী। যে-সমস্ত ঘটনাগুলি আমাদের কাছে আপতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কম বীররসের, এমনকী হীনবীর্যের প্রতীক, সেগুলি হয়ে উঠল 'জ্ঞান' -এর প্রতীক। আমার নিজের মনে হয়েছে, কাব্যের কথকতা, নাটকীয়তা এবং যুগের - পর - যুগ ধরে নীতি - বীররস -এর হাত ধঁরে যে-চরিত্র প্রস্ফুটিত হয় একটি 'পাঠ' -এর, তা ধ্রুপদী পাঠ, কিন্তু সত্য নয়। তাত্ত্বিক ধ্রুপদী পাঠের একস্তরীয় চরিত্র - বিশ্লেষণ ও সত্য থেকে কবি বুদ্ধদেব বসু কাব্যের এবং সত্যের আঙ্গিকে নিয়ে এসে মহাভারতের 'নায়ক' ধারণাটিরই এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন, যার ভিত্তি বাইরের শক্তি নয়, বরং অনেক বেশি ভিতরের শক্তি। আত্মশক্তি, যা ছিল যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

মজার কথা হল, ভারতীয় দর্শনেরও মূল কথা এই আত্মশক্তি, প্রজ্ঞা—যার প্রতিফলন প্রকট-কোনও ঘটনায় পাওয়া যায় না। এগুলি ইঙ্গিতের মাধ্যমে ধরা পড়ে। তার জন্য ঘটনার প্রাথমিক অভিঘাত কাটিয়ে ঘটনার আগে, পিছে, অন্তরে প্রবেশ করতে হয়। একজন মহাকাব্য - প্রণেতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রকে (মাউথ - পিস ক্যারেক্টার) অন্যতম - প্রধান করে রাখেন, কিন্তু একমাত্র - প্রধান করলেন না। কিন্তু, মহাকাব্যের ঘটনা - পরম্পরায় সেই চরিত্রটি কোনও এক মোক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। তাঁর অভিযাত্রার সঙ্গে - সঙ্গে কবিরও অভিযাত্রা চলতে থাকে। এই নিজস্ব অভিযাত্রাটি কবি তো একটু মনস্তাত্ত্বিক খেলায় লুকিয়ে রাখবেনই। গভীর পাঠকের কাজই হল, এই আপাত - পাঠ্যের ভিতের থাকা নিহিত 'পাঠ' -কে উদ্ধার করা। যে-কোনও প্রকৃত কবির পড়ার সময় যে-বহুস্তরীয় অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় পাঠককে, বিশেষ করে দীক্ষিত পাঠককে, তা যেন - বা এই দীর্ঘকালীন নানা প্রকরণে পাঠ - করা মহাকাব্যগুলির পাঠক্রিয়া থেকে হারিয়ে যায়। পড়ে থাকে বিচ্ছিন্নভাবে লোকায়ত ধারায় পাঠ করা কাহিনি বা আখ্যানগুলি। বুদ্ধদেব বসু 'মহাভারতের কথা' রচনার সময় নিজে যেমন সেই বিশেষ গভীরপাঠে চলে যান, তেমনই তাঁর মহাভারতের কথা গ্রন্থটি পাঠ করার সময় আমরাও, পাঠক হিসেবে মহাভারতকে

অন্যভাবে পাঠ করতে শিখতে থাকি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের পর বুদ্ধদেব বসু সেই ব্যক্তি, যিনি অনেক ব্যাপ্তি-সহ মহাভারতের মতো মহাকাব্য 'পাঠ' -এর এক অন্য প্রকরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দেন। এই নির্মাণ 'প্রবন্ধ' -র আকারে হলেও বুদ্ধদেব বসুর অননুকরণীয় গদ্যভাষায় ছোঁয়ায় হয়ে ওঠে অনেকটা কবিতার মতো। কখনও উপনিষদের সঙ্গে তুলনা - প্রতিতুলনা, কখনও একটি কাহিনি তুলে ধরে তার সঙ্গে অপর - একটি দূরবর্তী কাহিনির নিবিড়তম সম্পর্ক, কখনও ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে যুক্তি - বিন্যাসের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের আপাত-হীনবীর্যতার মধ্যে জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার গভীরতর উন্মোচন — ইত্যাদি নানাভাবে বুদ্ধদেব বসু উপস্থাপিত করেন ভারতীয় দর্শনকেই। তাই তাঁর 'মহাভারতের কথা' ভারতীয় দর্শনের কথাও বটে।

কিন্তু, মিলটন বা মাইকেলের মতো নয় বুদ্ধদেবের এই সৃষ্টিকাজ। এই সৃষ্টি এমন আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সৃষ্টি, যা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পাঠের - ভিতর - থাকা 'ধারণা' - টিকেই আক্রমণ করে। মিলটন বা মাইকেল যা করেছেন, তা এক প্রচলিত বীররসের ধারণাকে আক্রমণ করে বীররস প্রকৃতপক্ষে কোথায়, করুণরস প্রকৃতপক্ষে কোনদিকে, তাকেই নতুন আধারে উপস্থাপন। কিন্তু, বুদ্ধদেব বসু যা করেন, তা হল বীররস এক জিনিস, আর প্রজ্ঞা আর - এক। তিনি ঘটনা - বিন্যাস পরিবর্তন করলেন না এবং বীররসকেও ক্ষুণ্ণ করলেন না, বরং নিয়ে এলেন আরও - তীব্র -এক বীররসের বিশ্লেষণ, তা হল, এক প্রাজ্ঞ এক ব্যক্তির নিঃসঙ্গ লড়াই, তার বেদনা। তার সত্যের প্রতি অবিচল থাকা এবং তারই বিভিন্ন প্রাজ্ঞ পদক্ষেপের ফলে পরিবর্তিত -হয়ে - যাওয়া ঘটনা - বিন্যাসেও তাঁর নির্লিপ্ত অবস্থান। এ যেন কোনও কবি, যিনি ঘটনা - প্রতিঘটনায় অংশগ্রহণ করে তাকে তার নীরব প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনও করে দিচ্ছেন, রাস্তার মুখ খুলে দিচ্ছেন, নিজেও চলছেন, কিন্তু সেখানেও তিনি উপেক্ষিত, সমালোচিত। অথচ তাঁর সত্যিই কিছু করার নেই। তিনি নির্লিপ্তভাবে এই ভাঙাগড়ার কাজটি চালিয়ে যেতে পারেন মাত্র। কারণ, এই সবকিছুই তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞা ও অস্তিত্বের অভিযাত্রার অংশ। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারতের কথা'-য় এই যুধিষ্ঠিরকেই তুলে থরলেন, বা বলা ভাল, আবিষ্কার করলেন। তিনি ছিলেনই, কিন্তু নায়কত্বের বাসনা নিয়ে নয়। বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত করল যুধিষ্ঠিরের প্রজ্ঞার নির্লিপ্ততা, অথচ সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রণ আসলে আপাত - ঘটনার - ভিতরে - থাকা দর্শনের আপাত - ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক নিয়তির খেলা। এখানে প্রজ্ঞাই নিয়তি। নিয়তি যা কোনো ঋণাত্মক ঘটনার অর্থ নয়। নিয়তি হল ঔচিত্য। অর্থাৎ, প্রজ্ঞায় যা - যা ঘটে থাকে। একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা একজন কবি রাজনৈতিকভাবে আপাতদৃষ্টিতে এবং তৎকালীন প্রতিক্রিয়ায় সমালোচিত হতে পারেন, কিন্তু গভীরভাবে দেখতে গেলে একজন প্রকৃত কবি যা বলেন, যা পদক্ষেপ করেন, তা নির্বোধের মতো লাগলেও, পরবর্তিকালে বোঝা যায়, তাঁর ভাবনা বা পদক্ষেপটিই ছিল সঠিক।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান তথাকথিত বীররসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষপর্যন্ত এই প্রজ্ঞাই ঘটনাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তৈরি করে এক নিজস্ব অভিযাত্রার অভিঘাত, তা বুদ্ধদেব বসু বিশ্লেষণের মাধ্যমে, যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে, তথ্য, তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এবং চরিত্রগুলিকে নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছেন। লেখাটির শুরুতে আমি যা লিখেছি, অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর গদ্য 'ভাবতে - ভাবতে' যায়, তা এই গ্রন্থটি পড়ার সময়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়। যে - উর্ণনাভের মতো বিষয়কে তিনি উন্মোচিত করে তার মধ্যে জ্ঞানের অন্বেষণ করে দেখিয়েছেন, একজন ব্যক্তিমানুষের 'জ্ঞান' কীভাবে সেই ঊর্ণনাভ - তৈরি করে, তা এক প্রবল মেধা - চর্চার বিষয়। কিন্তু ,মনন, মেধা ও প্রাণ, এই তিনটি বিষয় বুদ্ধদেবের গদ্যে মিশে থাকার ফলে এই প্রবেশ, উন্মোচন, আবিষ্কার এবং আবিষ্কারটিকে যুক্তিবিন্যাসে প্রতিষ্ঠা করা— অন্য - কোন ও মানুষের পক্ষে এই সহজ সৃজনশীলতার মাধ্যমে সম্ভবত হত না বোধহয়। এখানে বুদ্ধদেবের গদ্য যেমন নিয়ন্ত্রণ করেছে ভাবনার গতিপ্রকৃতি, তেমনই ভাবনার গতি - প্রকৃতিও বুদ্ধদেবের গদ্যকে দিয়েছে নতুন মাত্রা, আর, তা হল— এই গ্রন্থের লেখায় নিহিত এক চমৎকার গদ্যছন্দ, যা, মনে হয় না তাঁর অন্য উৎকৃষ্ট লেখাগুলিতে আছে। বুদ্ধদেবের গদ্য এমনিতেই অসাধারণ। কিন্তু, মহাভারতের কথা গ্রন্থের গদ্য আধুনিক, ধ্রুপদী এবং সাংগীতিক, অথচ এই গ্রন্থটি প্রবন্ধেরই বলা চলে!

ভাবলেও অসাধারণ লাগে যে, দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করে - করে, বুদ্ধদেব বসু মহাভারতের কথা-র মতো এমন - এক গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যকে উপহার দিয়ে গেছেন। এই গ্রন্থটির দাবি কোনওদিন ফুরোবার নয়। এমন - এক বিষয় নিয়ে, নিজস্ব চোখে দেখে, সম্পূর্ণ অন্য - এক দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনকে উপস্থাপনার সাহসও আর - কারও হবে বলে মনে হয় না। মহাভারতের মতো মহাকাব্যের উপর গ্রন্থ হয়তো অনেক লেখা হবে, যুধিষ্ঠির বা কৃষ্ণের উপপর লেখ্য হয়তো অনেক, কিন্তু 'পাঠ' -এর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার এই যে-নতুনত্ব, এই যে-নিজস্বতা— তা আর হবে কি না সন্দেহ! কারণ বুদ্ধদেবেরই পথ অনুসরণ করলে বলতে হয়, এ হল প্রজ্ঞার নিয়তি।